১.১.৬ নদী, হিমবাহ ও বায়ুর কাজ

❖ নদীর কাজ ❖

❒ **ভূমিকা ঃ** যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি ভূমিরূপ বিবর্তনে অংশগ্রহণ করে নদী তাদের মধ্যে অন্যতম ও প্রধান। পৃথিবীর মোট ভূ-ভাগের প্রায় ৭০ শতাংশ অঞ্চল নদী বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে।

❒ **নদীর সংজ্ঞা ঃ** যে সকল স্বাভাবিক জলধারা তুষার গলা জল বা বৃষ্টির জলে পুষ্ট হয়ে বা প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূমির ঢাল অনুসারে উচ্চভূমি থেকে বহুদূর প্রবাহিত হবার পর সাগরে, হ্রদে বা অন্য কোনো জলধারায় এসে মিলিত হয় তাকে ***নদী*** বলে। যে সকল জলধারা পুরুষ নামে পরিচিত সেগুলিকে **নদ** এবং যেগুলি স্ত্রী নামে পরিচিত সেগুলিকে **নদী** বলা হয়।

○ **উপনদী ও শাখানদী ঃ** উচ্চভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে কোনো নদী কোনো বড়ো নদীতে এসে পড়লে তাকে **উপনদী** এবং কোনো বড়ো নদী থেকে অন্য কোনো নদী বেরিয়ে এসে সাগরে বা অন্য কোনো নদীতে বা সেই নদীতেই এসে পড়লে তাকে **শাখানদী** বলে।

○ **নদী অববাহিকা ও ধারণ অববাহিকা ঃ** কোনো প্রধান নদী ও তার উপনদী - শাখানদী মিলিত হয়ে যতটুকু জায়গা অধিকার করে আছে অর্থাৎ যতটুকু অঞ্চলে সেই নদী তার বিভিন্ন কাজ করে চলেছে, তাকে **নদী অববাহিকা** বলে। পার্বত্য অংশে নদী যতটুকু জায়গা অধিকার করে থাকে, তাকে **ধারণ অববাহিকা** বলে।

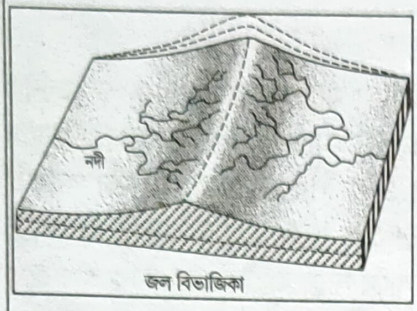

○ **জলবিভাজিকা (Watershed) ঃ যে উচ্চভূমি দুই বা ততোধিক নদী গোষ্ঠীকে পৃথক করে তাকে জলবিভাজিকা বলে।** পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি উচ্চভূমি জলবিভাজিকা রূপে অবস্থান করে। **ভারতের হিমালয় পর্বত, পশ্চিমঘাট পর্বত, বিন্ধ্য, সাতপুরা প্রভৃতি** গুরুত্বপূর্ণ জলবিভাজিকা।

○ **নদী উপত্যকা (River Valley) ঃ** নদীর উৎপত্তিস্থল থেকে মোহানা পর্যন্ত নদীখাতের উভয় পার্শ্বের উচ্চভূমির মধ্যে দীর্ঘ ও সংকীর্ণ নিম্নভূমিকে **নদী উপত্যকা** বলে।

○ **নদীর ক্ষয়সীমা (Base Level of Erosion) ঃ** নদীর নিম্নক্ষয়ের শেষ সীমাকেই **নদীর ক্ষয়সীমা** বলে। সাধারণভাবে **সমুদ্রতলই** হল নদীর ক্ষয়সীমা।

❐ নদী তার উপত্যকা বরাবর - **(ক) ক্ষয়, (খ) বহন ও (গ) অবক্ষেপণ বা সঞ্চয়ের** মাধ্যমে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়।

○ **(ক) নদীর ক্ষয়কাজ ঃ** নদীর ক্ষয়ের মাত্রা নির্ভর করে - (১) জলের গতিবেগ, (২) জলের পরিমাণ (৩) শিলাস্তরের প্রকৃতি, এবং (৪) নদীর মধ্যে বাহিত পদার্থের আয়তন ও পরিমাণের ওপর।

নদী সাধারণত **চার ভাবে** ক্ষয়কাজ করে। যথা -

(১) জলপ্রবাহ ক্ষয় ঃ পার্বত্য অংশে জলস্রোতের প্রবল আঘাতে নদীখাত ও নদীপাড়ের অপেক্ষাকৃত কোমল শিলা খুলে বেরিয়ে আসে, একেই ***জলপ্রবাহ ক্ষয়*** বলে। **(২) অবঘর্ষ ক্ষয় ঃ** নদী বাহিত নুড়ি, প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি নদীর তলদেশ ও পার্শ্বদেশে আঘাত করে উপত্যকাকে ক্ষয় করে গভীরতা বাড়ায়। একেই ***অবঘর্ষ*** বলে। **(৩) ঘর্ষণ ক্ষয় ঃ** নদীবাহিত বিভিন্ন আকারের প্রস্তরখণ্ড পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ভেঙে গিয়ে অবশেষে নুড়ি, বালি, ও পলিকণায় পরিণত হয়। একে **ঘর্ষণ ক্ষয়** বলে। **(৪) দ্রবণ ক্ষয় ঃ** নদী জলের সাথে দ্রবীভূত অম্লের প্রভাবে কিছু কিছু শিলাস্তর রাসায়নিক ভাবে বিয়োজিত হয়ে ক্ষয় হয়। একেই ***দ্রবণ ক্ষয়*** বলে।

○ **(খ) নদীর বহন কাজ ঃ** নদী ক্ষয়ের মাধ্যমে যে সকল পদার্থ সৃষ্টি করে নদীর জলের মাধ্যমেই তা বাহিত হয়। নদীর বহন ক্ষমতা নির্ভর করে (১) ***নদীর গতিবেগ,*** (২) ***জলের পরিমাণ*** এবং (৩) ***প্রবাহিত পদার্থের পরিমাণ ও আয়তনের ওপর।***

নদীর বহন প্রক্রিয়া ঃ নদী **চার ভাবে** ক্ষয়িত পদার্থ সমূহকে বহন করে। যথা —

(১) দ্রবণ প্রক্রিয়া ঃ নদীর জলে দ্রবীভূত অম্লের প্রভাবে শিলাস্তর বিয়োজিত ও দ্রবীভূত হয়ে বাহিত হয়। **(২) ভাসমান প্রক্রিয়া ঃ** অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম পলি ও বালি নদীর জলে ভাসমান অবস্থায় বাহিত হয়। **(৩) লম্ফদান প্রক্রিয়া ঃ** অপেক্ষাকৃত বড়ো প্রস্তরখণ্ডগুলি নদীর তলদেশে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। **(৪) আকর্ষণ প্রক্রিয়া ঃ** নদীর তলদেশ দিয়ে স্রোতের টানে ছোটো ছোটো নুড়ি নীচের দিকে নেমে আসে।

○ ***ষষ্ঠঘাতের সূত্র ঃ*** *নদীর বহন ক্ষমতা নির্ভর করে নদীর গতিবেগ, জলের পরিমাণ এবং পদার্থের পরিমাণের ওপর। যদি নদীর গতিবেগ কোনো কারণে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় তাহলে সেই নদীর বহন করার ক্ষমতা $২^৬$ বা ৬৪ গুণ হারে বাড়ে। একেই **ষষ্ঠঘাতের** সূত্র বলে।*

○ *কিউসেক ও কিউমেক ঃ নদীর জলপ্রবাহ মাপার একক হল **কিউসেক** ও **কিউমেক**। কিউসেক হল কিউবিক ফুট/সেকেন্ড এবং কিউমেক হল কিউবিক মিটার/সেকেন্ড।*

○ **(গ) নদীর অবক্ষেপ বা সঞ্চয় ঃ** নদীর বহন ক্ষমতা হ্রাস পেলে নদীবাহিত বিভিন্ন পদার্থ সমূহ বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত হয়। সাধারণভাবে নদী মধ্য ও নিম্নগতিতে সঞ্চয়ের কাজ করে।

○ *আদর্শ নদী ঃ ভূমির ঢাল ও নদীর কার্যের তারতম্য অনুসারে নদীর গতিপথকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়-(১) উচ্চগতি বা পার্বত্য প্রবাহ, (২) মধ্যগতি বা সমভূমি প্রবাহ এবং (৩) নিম্নগতি বা বদ্বীপ প্রবাহ। **যেসব নদীর এই তিনটি গতিই স্পষ্ট তাকেই আদর্শ নদী বলে**। ভারতের **গঙ্গা নদীকে আদর্শ নদী** বলা হয়। গঙ্গার উৎস, গোমুখ থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গার পার্বত্য প্রবাহ, হরিদ্বার থেকে পশ্চিমবঙ্গের ধূলিয়ান পর্যন্ত মধ্য প্রবাহ এবং ধূলিয়ান থেকে মোহানা পর্যন্ত নিম্ন প্রবাহ।*

❐ **নদী উপত্যকার বিভিন্ন রূপ ঃ** ক্ষয়, বহন এবং অবক্ষেপণের তারতম্যের জন্য নদীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আকৃতির উপত্যকা গঠিত হয়। নিচে চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন গতিতে নদী উপত্যকার বিভিন্ন রূপ দেখান হল।

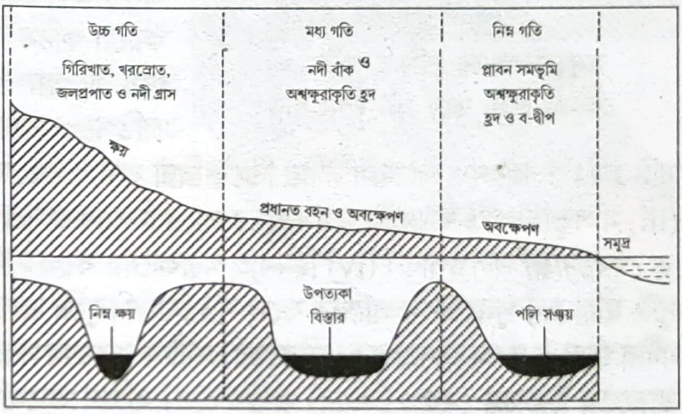

বিভিন্ন গতিতে নদী উপত্যকার রূপ

❐ ***বিভিন্ন গতিতে নদীর কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ ঃ***

○ **উচ্চগতি বা পার্বত্য প্রবাহে নদীর কাজ ঃ** উচ্চগতি বা পার্বত্য প্রবাহে নদীর ঢাল খুব বেশি বলে নদী প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় এবং নদীবাহিত পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকায় নদীর প্রধান কাজ ক্ষয়সাধন এবং ক্ষয়িত পদার্থের বহন। পার্বত্য প্রবাহে নদী সঞ্চয় কাজ প্রায় করে না বললেই চলে। উচ্চগতি বা পার্বত্য প্রবাহে ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট প্রধান ভূমিরূপগুলি হল —

(১) I ও V আকৃতির উপত্যকা ঃ পার্বত্য প্রবাহে ভূমির ঢাল বেশি হওয়ায় নদী প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। নদীবাহিত প্রস্তরখণ্ড ক্রমাগত নদীর তলদেশে আঘাত করে অবঘর্ষ পদ্ধতিতে ক্ষয় করে। এই সময়ে নদীর নিম্নক্ষয় খুব বেশি, কিন্তু পার্শ্বক্ষয় খুব কম হয়। ফলে নদী উপত্যকা সংকীর্ণ ও গভীর হয় এবং 'I'- এর আকার ধারণ করে। নদী উপত্যকা বিবর্তনের পরবর্তী অবস্থায় উপত্যকার পার্শ্বস্থ অংশ আবহবিকার, জলপ্রবাহ, ধস প্রভৃতি কারণে ক্ষয় হয়ে ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে এবং 'I' উপত্যকা 'V' আকৃতিতে পরিণত হয়।

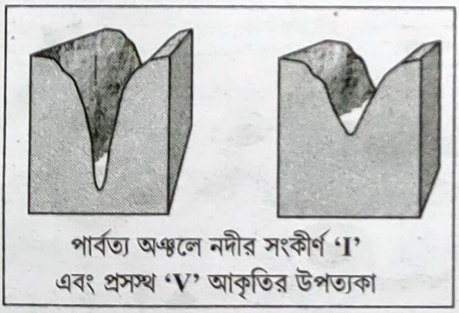
পার্বত্য অঞ্চলে নদীর সংকীর্ণ 'I' এবং প্রসস্থ 'V' আকৃতির উপত্যকা

(২) গিরিখাত ও ক্যানিয়ন ঃ নদী উপত্যকা অত্যন্ত গভীর ও সংকীর্ণ হলে তাকে গিরিখাত বলে। গিরিখাতে উপত্যকার বিস্তার অপেক্ষা গভীরতা অত্যন্ত বেশি হয় ও সুউচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে নদী ক্রমাগত নিম্নক্ষয়ের ফলেই গিরিখাত সৃষ্টি করে। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, প্রভৃতি নদীতে ও আফ্রিকার জাম্বেসি নদীতে এরূপ গিরিখাত দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর ***এল-ক্যানন দ্য কলকা*** (৩,২২৩ মিটার গভীর) পৃথিবীর গভীরতম গিরিখাত। শুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টির অভাবে উপত্যকার পার্শ্বক্ষয় হয় না, কিন্তু নিম্নক্ষয় বেশি হয়। ফলে উপত্যকা অত্যন্ত গভীর ও সংকীর্ণ হয়। শুষ্ক অঞ্চলে অতি গভীর ও সংকীর্ণ গিরিখাতকে ***ক্যানিয়ন বলে***। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো

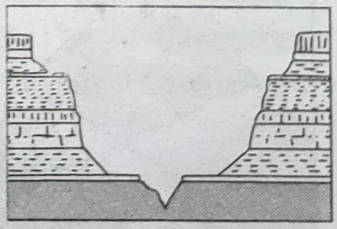
গ্রান্ড ক্যানিয়নের প্রস্থচ্ছেদ

নদীর ***গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন*** পৃথিবীর বৃহত্তম ক্যানিয়ন। কোনো কোনো অংশে এর গভীরতা প্রায় ১,৬০০ মিটার

(৩) গাঠনিক সোপান (Structural Bench) ঃ নদী উপত্যকায় পর্যায়ক্রমে কঠিন ও নরম শি সমান্তরালে অবস্থান করলে ক্ষয়কার্যের পার্থক্যের কারণে উপত্যকা ধাপে ধাপে গঠিত হ একে **গাঠনিক সোপান** বলে।

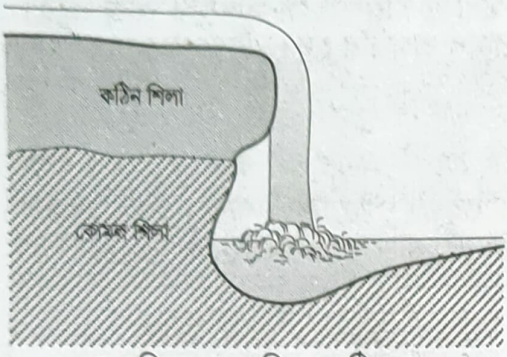

অনুভূমিকভাবে সজ্জিত কঠিন ও কোমল শিলা স্তরে সৃষ্ট জলপ্রপাত

(৪) জলপ্রপাত ঃ পার্বত্য অংশে উপত্যকার ঢা অসম হলে নদীর জল ওপর থেকে নীচের দি প্রবল বেগে পড়ে। একেই ***জলপ্রপাত*** বলে জলপ্রপাত বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হতে পারে — (i) নদীর গতিপথে কঠিন ও নরম শিলাস্তর অনুভূমিক, উল্লম্ব, বা তির্যকভাবে পরস্পর অবস্থান করলে কঠিন শিলা অপেক্ষা নরম শিলা বেশি ক্ষয় হয়ে নীচু হয় ও জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। (ii) নদীর গতিপথে আড়াআড়ি ভাবে চ্যুতি ঘটলে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ - জাম্বেসি নদীর **ভিক্টোরিয়া** জলপ্রপাত, ভারতের নর্মদা নদীতে **কপিলধারা**। (iii) মালভূমি অতি খাড়াভাবে সমভূমির সাথে মিশলে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়, যেমন কর্ণাটকের ***যোগ বা গেরসোপ্পা*** জলপ্রপাত। (iv) হিমবাহ ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ঝুলন্ত উপত্যকাতেও জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। (v) পুনর্যৌবন লাভের ফলে সৃষ্ট নিক বিন্দুতে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়। যেমন - সুবর্ণরেখা নদীর **জনা** ও **দশম** জলপ্রপাত। **ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের সরাবতী নদীর ওপর যোগ বা গেরসোপ্পা ভারতের উচ্চতম (২৫৩ মিটার) জলপ্রপাত। দক্ষিণ আমেরিকার *সাল্টো অ্যাঞ্জেল* (৯৭৯ মি) পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *নায়াগ্রা* জলপ্রপাত পৃথিবীর সুদৃশ্য জলপ্রপাত।**

○ ***খরস্রোত, কাসকেড, ক্যাটার‍্যাক্ট ঃ*** *জলপ্রপাতের ঢাল খুব বেশি হলে তাকে **খরস্রোত** বলে। জলপ্রপাত একাধিক ধাপে ধাপে নেমে এলে তাকে **কাসকেড** বলে। নর্মদা নদীর উৎসের কাছে কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে কাসকেড দেখা যায়। জলপ্রপাতে বিপুল পরিমাণে জল প্রবাহিত হলে তাকে **ক্যাটার‍্যাক্ট** বলে।*

(৫) প্লাঞ্জ পুল ঃ জলপ্রপাতে জল যেখানে প্রবলবেগে নীচে পড়ে সেখানে বিশালাকার হাঁড়ির মতো গর্তের সৃষ্টি হয়। একে **প্লাঞ্জ** পুল বলে।

(৬) মন্থকূপ বা পটহোল ঃ নদীর গতিপথে কোমল শিলা অবস্থান করলে অবঘর্ষ পদ্ধতিতে শিলাখণ্ডের আঘাতে গর্তের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে এই গর্তের মধ্যে জল চক্রের আকারে প্রস্তর খণ্ডসহ ঘুরতে ঘুরতে ক্ষয় করে এবং গর্তকে আরও গভীর করে। একেই ***মন্থকূপ বা পটহোল*** বলে। মন্থকূপের পরিধি কয়েক সেমি থেকে কয়েক মিটার পর্যন্ত হয় এবং এর গভীরতা পরিধির থেকে বেশি হয়। নদীগর্ভে ৭ মিটারেরও বেশি গভীর মন্থকূপ দেখা গেছে। ঝাড়খণ্ডে সরাইকেল্লার নিকট **খরকাই নদীগর্ভে** একসঙ্গে অসংখ্য মন্থকূপ দেখা যায়। অসংখ্য পটহোল একত্রে অবস্থান করে **পটহোল কলোনি** গঠন করেছে।

নদীর বুকে ছোট ছোট গর্ত বা পট হোল বা মন্থকূপ

আবদ্ধ শৈলশিরা

(৭) আবদ্ধ বা শৃঙ্খলিত শৈলশিরা ঃ পার্বত্য অংশে নদী পথের বাধাস্বরূপ শৈলশিরা বা পাহাড় থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নদী এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হয় এবং শৈলশিরাগুলিকে তখন দূর

থেকে উপত্যকার মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় আছে বলে মনে হয়। একে *আবদ্ধ বা শৃঙ্খলিত শৈলশিরা বলা হয়।*

○ **মধ্য ও নিম্নগতিতে নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপঃ** পার্বত্য অংশ ছেড়ে নদী সমভূমিতে প্রবেশ করা মাত্র ভূমির ঢাল কমে যায় বলে নদীর বেগও কমে যায় এবং নদী বাহিত পদার্থসমূহ সঞ্চয় হতে থাকে। ফলে নদী উপত্যকা ক্রমশ অগভীর হয়। নদীতে জলের পরিমাণ এই অংশে বাড়ে বলে পার্শ্বক্ষয় চলতে থাকে, ফলে নদী উপত্যকা অগভীর ও চওড়া হয়। মধ্য ও নিম্নগতিতে নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ হল—

(১) পলল শঙ্কু এবং পলল ব্যজনী বা পলল পাখা ঃ পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে নদী সমভূমিতে প্রবেশ করা মাত্র গতিপথের ঢাল হঠাৎ কমে যায় বলে নদী বাহিত বালি, নুড়ি, কাঁকর, প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি পর্বতের পাদদেশে শঙ্কুর আকারে সঞ্চিত হয়। এটি ***পলল শঙ্কু*** নামে পরিচিত।

পলল ব্যজনী বা পলল পাখা

পলল শঙ্কুর উপর দিয়ে নদী বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হলে পলল শঙ্কু অর্ধগোলাকার আকৃতিতে ভাগ হয়ে পড়ে। হাতপাখার মতো দেখতে, প্রায় গোলাকার এই ভূমিরূপকে **পলল ব্যজনী** বা **পলল পাখা** বলে। পলল পাখার উচ্চতা পলল শঙ্কুর থেকে কম হয়। সাধারণত যে সকল নদীর জলপ্রবাহ বেশি, কিন্তু পলির পরিমাণ কম সেখানেই ***পলল ব্যজনীর সৃষ্টি*** হয়। হিমালয়, রকি, আন্দিজ প্রভৃতি পর্বতের পাদদেশের প্রায় সকল নদীতেই পলল ব্যজনী গড়ে উঠেছে।

(২) চওড়া ও অগভীর নদী উপত্যকা ঃ মধ্যগতিতে নদীর নিম্নক্ষয় থাকে না কিন্তু নদীগর্ভে সঞ্চয় এবং পার্শ্বক্ষয় চলতে থাকে, ফলে উপত্যকা চওড়া ও অগভীর হয়।

(৩) নদী চর ও নদী দ্বীপ ঃ নদীর বহন ক্ষমতা কমে গেলে নদীবাহিত পদার্থগুলিকে নদী তার গর্ভে ক্রমাগত সঞ্চয় করে চর বা চড়ার সৃষ্টি করে। চর বা চড়া অংশে সঞ্চয় আরও বাড়লে তা ক্রমশ দ্বীপে পরিণত হয়। একে **নদী দ্বীপ** বলে। ভারতের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীতে অসংখ্য চর ও নদী দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদের উপর ***'মাজুলী'*** ভারতের বৃহত্তম নদী দ্বীপ। আমাজন নদীর ***'ইলহা-দ্য-মারাজো'*** পৃথিবীর বৃহত্তম নদী দ্বীপ।

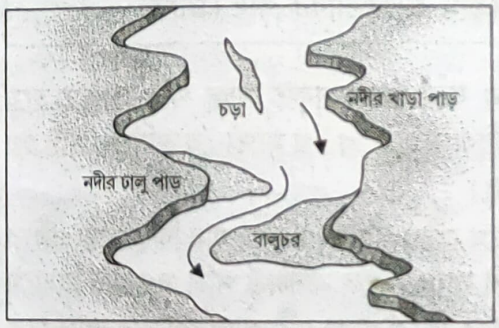

নদীখাতে চর বা চড়া

নদীর মধ্যে অসংখ্য চর ও নদী দ্বীপের সৃষ্টি হলে নদী বহু শাখায় ভাগ হয়ে বিনুনির আকারে এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। একে **বিনুনি নদী** (Braided Stream) বলে। তিস্তা, তোর্সা ও জলঢাকায় এরূপ বিনুনি প্রবাহ দেখা যায়।

(৪) আঁকাবাঁকা গতিপথ বা মিয়েন্ডার ঃ সমভূমিতে নদী প্রবাহ পথে বাধা পেলে তা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। বাঁকের যে অংশে জলস্রোত আঘাত করে সেখানে ক্ষয় হয় এবং বিপরীত অংশে সঞ্চয় হয়। এই সঞ্চয়কে ***বিন্দুবার*** (Point bar) বলে। এইভাবে ক্রমশ ক্ষয় ও সঞ্চয়ে নদীতে অসংখ্য নদীবাঁকের সৃষ্টি হয়। একে ***মিয়েন্ডার*** বলে। তুরস্কের **'মিয়েন্ডারেস'** নদীর নাম অনুসারে এইরূপ নদীপ্রবাহের নামকরণ হয় ***মিয়েন্ডার***। গঙ্গা অববাহিকায় প্রায় সব নদীতে মিয়েন্ডার দেখা যায়।

(৫) অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ ঃ নদী খুব এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হলে এবং পার্শ্বক্ষয় চলতে থাকলে একসময় বাঁকের মধ্যবর্তী স্থান সংকীর্ণ হয়ে অবশেষে যুক্ত হয় এবং নদী সোজা পথে প্রবাহিত হয়। পরিত্যক্ত বা অবশিষ্ট বাঁকটি তখন হ্রদের আকারে অবস্থান করে। এই ধরনের হ্রদ দেখতে ঘোড়ার ক্ষুরের মতো বলে

একে **অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ** বলে। গঙ্গা নদীর নিম্ন আবাহিকায় অসংখ্য অশ্বক্ষুরাকৃতির হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে।

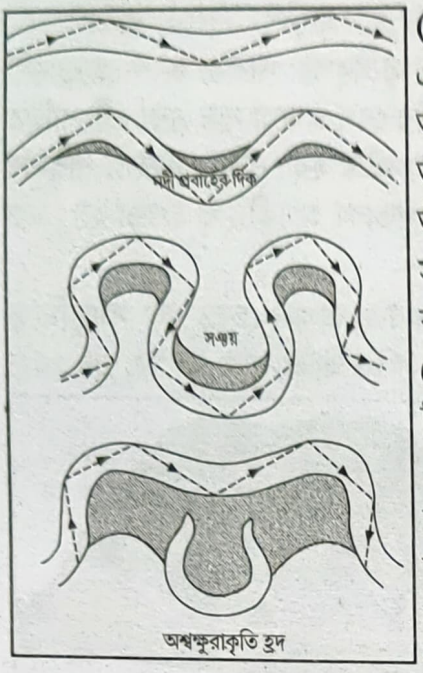

অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ

(৬) স্বাভাবিক বাঁধ ও প্লাবনভূমি ঃ নিম্নপ্রবাহে নদীর গতিবেগ একদম কমে যায়। ফলে, নদীগর্ভ পলিতে ভরে যায় এবং অগভীর হতে থাকে। দীর্ঘকাল পলি সঞ্চয়ের ফলে নদীগর্ভ ভরাট হয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায় উঁচু হয়। নদীর দুই তীরে পলি সঞ্চয়ের ফলে বাঁধের আকারে দীর্ঘ যে ভূমি সৃষ্টি হয় তাকেই ***স্বাভাবিক বাঁধ বা লিভি বলে***। গড়ে স্বাভাবিক বাঁধের উচ্চতা ২ - ৩ মিটার পর্যন্ত হয়। তবে মিসিসিপি, পো, হোয়াংহো নদীতে স্বাভাবিক বাঁধের উচ্চতা ৭ - ১০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক বাঁধ নদীর নিম্ন অববাহিকাকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে। তবে নদীতে জলের প্রবাহ অত্যধিক বাড়লে নদীর জল স্বাভাবিক বাঁধকে অতিক্রম করে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে প্লাবিত করে। প্লাবনের ফলে উপত্যকা অংশে পলি থিতিয়ে এক আস্তরণ পড়ে যে ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তাকেই ***প্লাবনভূমি*** বলে। প্লাবনভূমিতে প্রায় প্রতি বছর নতুন পলির সঞ্চয় ঘটে। **প্লাবনভূমিতে লিভি ছাড়াও পলিমাটির স্তূপ, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, জলাভূমি বা বায়ুই প্রভৃতি দেখা যায়। গঙ্গা, সিন্ধু, প্রভৃতি নদীর নিম্ন অববাহিকায় প্লাবনভূমি গড়ে উঠেছে।**

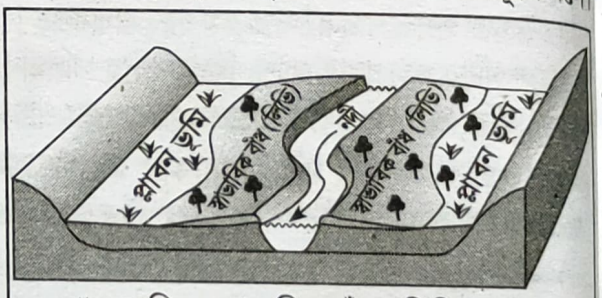

প্লাবনভূমি ও স্বাভাবিক বাঁধ (লিভি)

(৮)বদ্বীপ ঃ নদী প্রবাহের শেষ অবস্থায় নদী যখন সাগর বা হ্রদে মিলিত হয় তখন মোহানায় দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম পলি সঞ্চিত হয়ে মাত্রাহীন 'ব' বা গ্রিক অক্ষর 'Δ'-র মতো যে ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় তাকে ***বদ্বীপ*** বলে।

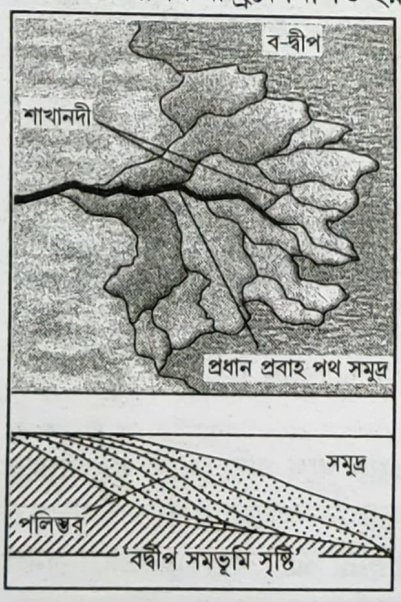

মোহানার মুখে নদীর গতিবেগ কমে যায় কিন্তু সূক্ষ্ম পলির পরিমাণ খুব বেশি থাকে, ফলে নদীগর্ভ পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে ভরাট হয়ে উঁচু হতে থাকে এবং নদী শাখাপ্রশাখায় ভাগ হয়ে প্রবাহিত হয়। দুই শাখার অন্তর্বর্তী অংশ মাত্রাহীন 'ব' এর আকার ধারণ করে। প্রথম অবস্থায় এই অংশ নীচু জলাশয় হিসাবে অবস্থান করে। পরবর্তীকালে নদীর সঙ্গে সমুদ্রতরঙ্গ বাহিত পলিও সঞ্চিত হয় এবং নিম্নাংশটি ক্রমশ ভরাট হয়ে 'ব' দ্বীপ গঠন করে। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ বড়ো বড়ো নদীর মোহানায় বদ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে। **গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ।**

○ ***বদ্বীপ গঠনের পরিবেশ ঃ*** *নদীর মোহানায় বদ্বীপ গঠিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন ঃ (১) মোহানাকে মৃদু ঢালে সমুদ্রের সাথে মিশতে হবে। (২) সমুদ্র জলের লবণতা বেশি হলে পলি দ্রুতহারে অধঃক্ষিপ্ত হবে। (৩) নদী অববাহিকার ক্ষেত্রমান যত বেশি হবে পলির পরিমাণও নদীতে তত বাড়বে। (৪) মধ্য ও নিম্নগতির দৈর্ঘ্য বেশি হতে হবে। (৫) ধারণ অববাহিকায় ক্ষয় যত বেশি হবে নদীতে পলির পরিমাণ তত বাড়বে। (৬) মোহানার কাছে সমুদ্রে জোয়ারভাটার প্রকোপ কম হতে হবে।*

আকৃতি অনুযায়ী বদ্বীপ ঃ আকৃতি অনুযায়ী বদ্বীপ চার প্রকার। **(ক) 'ব' আকৃতি** - গঙ্গা, নীল, পো বদ্বীপ। **(খ) পাখির পা বা আঙুলের মতো ঃ** মিসিসিপি বদ্বীপ। **(গ) করাতের দাঁতের মতো ঃ** ইতালির তাইবার বদ্বীপ। **(ঘ) খাড়ীয় বদ্বীপ ঃ** জার্মানির রাইন বদ্বীপ।

❖ হিমবাহের কার্য ❖

হিমবাহ হল বরফের নদী। বিশালাকার বরফ স্তূপ অভিকর্ষের টানে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে এলে তাকে ***হিমবাহ*** বলে। ভূমিরূপ বিবর্তনে হিমবাহের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

○ *হিমরেখা ঃ ভূপৃষ্ঠের যে সীমারেখার উপর সারাবছর তুষার জমে থাকে অথবা যার নীচে তুষার গলে জলে পরিণত হয় তাকেই* ***হিমরেখা*** *বলে। (১) অক্ষাংশ, (২) উচ্চতা, (৩) ভূমির ঢাল, (৪) ঋতু পরিবর্তন, (৫) বায়ুর গতিবেগ প্রভৃতির ওপর হিমরেখার অবস্থান নির্ভর করে। অক্ষাংশের মান বৃদ্ধির সাথে সাথে যেহেতু উষ্ণতা কমতে থাকে, তাই হিমরেখার উচ্চতাও কমতে থাকে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে ৫,৫০০, হিমালয় পর্বতে ৪,৫০০, আল্পস পর্বতে ২,৫০০ মিটার উচ্চতায় এবং মেরু অঞ্চলে সমুদ্রতলে হিমরেখা অবস্থান করে।*

❐ **হিমবাহের উৎপত্তি ও প্রবাহ ঃ** হিমরেখার উর্ধ্বে প্রচণ্ড শৈত্যের কারণে বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প তুষাররূপে সঞ্চিত হয়। ক্রমবর্ধমান চাপে ও ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ায় তুষার, দানাদার বরফ, নেভে এবং শেষে কঠিন বরফের স্তূপ হিমবাহে পরিণত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে অভিকর্ষের টানে ধীরে ধীরে নেমে আসে।

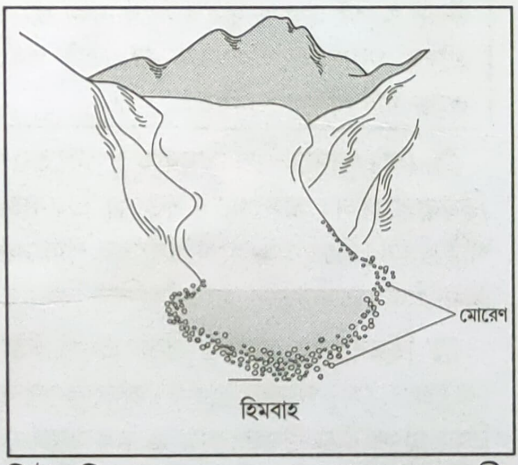

হিমবাহের গতিবেগ খুব ধীর। সারাদিনে হিমবাহ কয়েক সেমি থেকে কয়েক মিটার নীচে নামে। হিমবাহের আকৃতি ও ভূমির ঢালের ওপর হিমবাহের গতিবেগ নির্ভর করে। গ্রিনল্যান্ডের **কোয়ারেক** (Quarayaq) পৃথিবীর **দ্রুততম হিমবাহ**। এর গড় গতিবেগ দিনে ২০ - ২৫ মিটার।

❐ **হিমবাহের শ্রেণিবিভাগ ঃ** অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে ***অ্যালম্যান*** (Ahlmann) ১৯৪৮ সালে হিমবাহকে প্রধান তিনটি ভাগে এবং সেগুলিকে ১১ টি উপবিভাগে ভাগ করেন। - (ক) ***মহাদেশীয় হিমবাহ,*** (খ) ***পার্বত্য বা উপত্যকা হিমবাহ*** এবং (গ) ***পাদদেশীয় হিমবাহ।***

○ **(ক) মহাদেশীয় হিমবাহ ঃ** উচ্চ অক্ষাংশে মহাদেশব্যাপী বিশালাকার বরফের স্তূপকে ***মহাদেশীয় হিমবাহ*** বলে। বর্তমানে সুমেরু, কুমেরু ও সন্নিহিত অঞ্চলে এই হিমবাহ দেখা গেলেও প্রাচীনকালে প্রায় ৩০ লক্ষ বছর আগে প্লিসটোসিন যুগে পৃথিবীর ১/৩ অংশই মহাদেশীয় হিমবাহে ঢাকা ছিল। **বৈশিষ্ট্য ঃ (১)** ব্যাপ্তি বিশাল, **(২)** গভীরতা খুব বেশি, **(৩)** দেখতে কতকটা গম্বুজের মতো, **(৪)** তুষারের চাপে বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত হয়, **(৫)** নুনাটক দেখা যায়। **(৬)** এর থেকে **হিমশৈলের*** সৃষ্টি হয়। **অ্যান্টার্কটিকার ল্যাম্বার্ট পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশীয় হিমবাহ।**

○ ***হিমশৈল ঃ মহাদেশীয় হিমবাহ বিস্তৃত হয়ে সমুদ্রের নিকটে চলে আসে এবং সমুদ্রের স্রোত ও তরঙ্গের ধাক্কায় হিমবাহের প্রান্তভাগ ভেঙে গিয়ে জলে ভাসতে থাকে। সমুদ্রজলে ভাসমান বরফের স্তূপকে হিমশৈল বলে। হিমশৈলের মাত্র ১/৯ অংশ জলের উপরে ভেসে থাকে।***

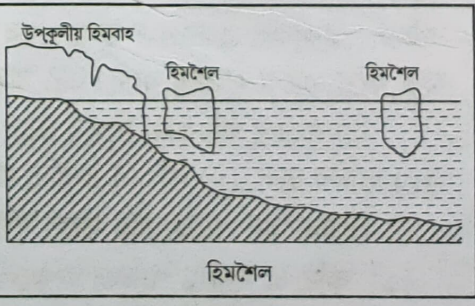

○ **(খ) উপত্যকা বা পার্বত্য হিমবাহ ঃ** উচ্চ পর্বত বা পর্বতের উপত্যকায় দীর্ঘকাল ধ
স্তূপাকারে তুষার জমে বরফে পরিণত হলে এবং তা অভিকর্ষজ টানে নেমে এলে তাকে ***পার্ব***
বা উপত্যকা হিমবাহ বলে। এটি আল্পীয় হিমবাহ নামে পরিচিত। অভিকর্ষের টানে এই হিমবা
উপত্যকা বরাবর নীচের দিকে ধীরে ধীরে নেমে আসে এবং হিমরেখা অতিক্রম করে গলে গিয়ে নদী
সৃষ্টি করে। এই হিমবাহে **বার্গস্রুন্ড*** এবং **ক্রেভাস*** সৃষ্টি হয়। **আলাস্কার হুবার্ড পৃথিবীর বৃহত্ত**
(১১৫ কিমি লম্বা, ১০ কিমি চওড়া) উপত্যকা হিমবাহ। ভারতের কারাকোরাম পর্বতের **বল্টারো**
হিস্পার, সিয়াচেন (ভারতের বৃহত্তম), হিমালয় পর্বতের **রূপাল, রিমো, জেমু, গঙ্গোত্রী** প্রভৃতি
বিখ্যাত পার্বত্য হিমবাহ।

○ ***বার্গস্রুন্ড (Bergschrund) এবং ক্রেভাস (Crevasse) ঃ*** *উঁচু পর্বত থেকে উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিমবাহ নামার সময় হিমবাহ ও পর্বত গাত্রের মধ্যে যে সংকীর্ণ ফাঁকের সৃষ্টি হয় তাকে **বার্গস্রুন্ড** বলে। এই ফাঁক বা ফাটল হিমবাহের পৃষ্ঠদেশ থেকে তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। বছরের বেশিরভাগ সময়ই বার্গস্রুন্ড অঞ্চল পাতলা তুষার দিয়ে ঢাকা থাকে।*

*হিমবাহের উপর সমান্তরাল ও আড়াআড়ি ফাটল একসাথে অবস্থান করলে তাকে **ক্রেভাস** বলে। বেশি বা অসম ঢাল বিশিষ্ট উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিমবাহ নামার সময় হিমবাহের মধ্যে অসংখ্য ক্রেভাস সৃষ্টি হয়। বার্গস্রুন্ড ও ক্রেভাস উভয় অংশই হালকা তুষার দিয়ে ঢাকা থাকে বলে দূর থেকে এদের অবস্থান বোঝা যায় না। তাই পর্বত অভিযাত্রীদের কাছে এটি বিপদের বিষয়।*

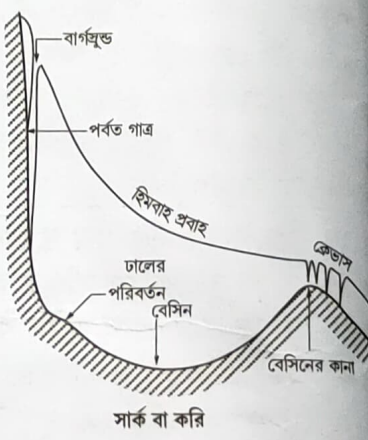

সার্ক বা করি

❐ **(গ) পাদদেশীয় হিমবাহ ঃ** পর্বতের পাদদেশে হিমবাহ অবস্থান করলে তাকে ***পাদদেশী***
হিমবাহ বলে। অসংখ্য উপত্যকা হিমবাহ পর্বতের পাদদেশে এসে সঞ্চিত হলে এই হিমব
গঠিত হয়। উচ্চ অক্ষাংশে পর্বতের পাদদেশে উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে থাকায় পাদদেশীয় হিমব
দেখা যায়। আলাস্কার ***ম্যালাসপিনা*** বিখ্যাত পাদদেশীয় হিমবাহের উদাহরণ।

❐ **হিমবাহের কার্য ঃ** হিমবাহ পার্বত্য উপত্যকায় অবস্থান করলে জলস্রোতের মতে
(ক) **ক্ষয়**, (খ) **পরিবহন**, (গ) **অবক্ষেপণ বা সঞ্চয়** কার্যের মাধ্যমে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটা
হিমবাহ পার্বত্য উপত্যকায় ক্ষয়ের ফলে যেমন ভূমিরূপের বৈচিত্র্য আনে, তেমনি ক্ষয়ের ফ
সৃষ্ট পদার্থ উপত্যকা ও পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ সৃষ্টি করে।

❐ **ক্ষয়কার্যের পদ্ধতি ঃ** হিমবাহ **(১) উৎপাটন ও (২) অবঘর্ষ** প্রক্রিয়ায় ক্ষয়কাজ করে।

(১) উৎপাটন (Plucking) ঃ হিমবাহের মাধ্যমে পর্বতগাত্র থেকে শিলাখণ্ডের উঠে আসাকে **উৎপাটন** বলে। পর্বতগাত্র ও উপত্যকার তলদেশের সঙ্গে হিমবাহের ঘর্ষণের ফলে হিমবাহে কিয়দংশ গলে গিয়ে জলে পরিণত হয়। শিলা ফাটলে জল প্রবেশ করলে তা জমে বর পরিণত হয় এবং আয়তনে বেড়ে গেলে চাপের সৃষ্টি করে। ফলে শিলাস্তর ভেঙে টুকরো টুক হয় এবং হিমবাহের চাপে তা সহজেই উৎপাটিত হয়। **(২) অবঘর্ষ (Abrassion) ঃ** হিমবাহে মধ্যে বিভিন্ন আকৃতির উৎপাটিত শিলাখণ্ড জমাটবদ্ধ অবস্থায় থাকে। হিমবাহ চলতে শু করলে ওই সকল প্রস্তরখণ্ড তলদেশের ভূমিরূপ বা শিলাস্তরের ওপর ঘর্ষণের ফলে শিলাস্তর ক্ষয় করে, একে **অবঘর্ষ** বলে। এর প্রভাবে ভূমিভাগ ক্রমশ মসৃণ হয়।

হিমবাহের ক্ষয়কাজ নির্ভর করে - (i) হিমবাহের গতিবেগ, (ii) গভীরতা, (iii) স্থায়ি (iv) ভূমির ঢাল, (v) শিলার প্রকৃতি প্রভৃতির ওপর।

❐ **হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ ঃ**

(১) করি বা সার্ক ঃ পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহ উৎপাটন ও অবঘর্ষ প্রক্রিয়ায় ক্ষয় করে হা যুক্ত চেয়ার বা অ্যাম্ফিথিয়েটারের মতো ভূমিরূপ সৃষ্টি করে। একেই ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে ক

ালে **সার্ক**, নরওয়েতে **বন**, ওয়েলসে **কাম**, এবং জার্মানিতে **কার** বলে। একটি করি বা সার্কের তনটি অংশ থাকে - (i) মস্তকের দিকে খাড়া প্রাচীর, (ii) মধ্যভাগে খাত এবং (iii) প্রান্তভাগ।

২) করি হ্রদ ঃ হিমবাহ সৃষ্ট করির মধ্যবর্তী খাতটিতে নেক সময় অবশিষ্ট অংশ হিসাবে হিমবাহ থেকে যায়, রবর্তীকালে হিমবাহ গলে গিয়ে হ্রদের সৃষ্টি করে। কে ***করি হ্রদ*** বলে।

করি, সার্ক ও পিরামিড চূড়া

৩) এরিটি বা আরেৎ ঃ করি বা সার্কগুলির মস্তক দশ হিমবাহের মাধ্যমে ক্ষয় হয়ে ক্রমশ প্রসারিত হতে াকে। ফলে পাশাপাশি দুটি করির মধ্যবর্তী অংশ সংকীর্ণ তীক্ষ্ণ প্রাচীর রূপে অবস্থান করে। একেই **এরিটি** লে।

(৪) পিরামিড চূড়া বা হর্ন ঃ উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে য়েকটি এরিটি বিপরীতমুখী অবস্থানের ফলে মধ্যবর্তী গটিকে পিরামিডের মতো দেখায়। একে **পিরামিড চূড়া** বা **হর্ন** বলে। সুইটজারল্যান্ডের আল্পস র্বতের **ম্যাটারহর্ন** এরূপ একটি পিরামিড চূড়া। **ম্যাটারহর্ন**-এর নাম অনুসারেই এই ভূমিরূপের মকরণ হয়েছে **হর্ন**। কুমায়ুন হিমালয়ের বদ্রীনাথের নিকট **নীলকণ্ঠ**, নেপালের **মাকালু** পিরামিড ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(৫) 'U' আকৃতি বিশিষ্ট হিমবাহ উপত্যকা ঃ পার্বত্য অঞ্চলে নদী উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হলে হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে উপত্যকা অনেকটা 'U' আকৃতির রূপ ধারণ করে। **একেই হিমদ্রোণী 'U' আকৃতি উপত্যকা বলে।** এই অংশে উপত্যকার গভীরতা ও বিস্তার বেশি।

হিমদ্রোণী বা হিমখাত

(৬) হিমসিঁড়ি বা হিমসোপান ঃ হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলে অসম ক্ষয়কার্যের ফলে উপত্যকা বরাবর সিঁড়ি বা ধাপের সৃষ্টি হয়। **একেই হিমসিঁড়ি বা হিমসোপান বলে।**

(ক) হিমসিঁড়ির নিম্নপ্রান্ত থেকে উত্থিত খাড়া অংশ হল **রাইজার**, (খ) পশ্চাৎমুখী ঢাল বিশিষ্ট ধাপের সমতল অংশ হল **ট্রেড** এবং (গ) **রাইজার** ও **ট্রেডের** মধ্যবর্তী অংশটিকে গেল বলে। হিমসিঁড়ি অংশে হিমবাহ সরে গিয়ে জল মে হ্রদের সৃষ্টি হলে তাকে ***প্যাটারনস্টার হ্রদ*** বলে।

) ঝুলন্ত উপত্যকা ঃ প্রধান হিমবাহের সাথে ছোটো োটো হিমবাহ এসে মিলিত হয়। প্রধান হিমবাহ বৃহৎ ওয়ায় তার দ্বারা সৃষ্ট উপত্যকা ক্ষুদ্র উপ-হিমবাহ সৃষ্ট পত্যকা অপেক্ষা বেশি গভীর হয়। এরূপ অবস্থায় ুদ্রকার হিমবাহ উপত্যকা মনে হয় যেন প্রধান হিমবাহ পত্যকার ওপর ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। একেই **ঝুলন্ত পত্যকা** বলে। ঝুলন্ত উপত্যকায় হিমবাহ সরে গিয়ে ী প্রবাহিত হলে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। বদ্রীনাথের কট **ঋষিগঙ্গা** উপত্যকা ঝুলন্ত উপত্যকার উদাহরণ।

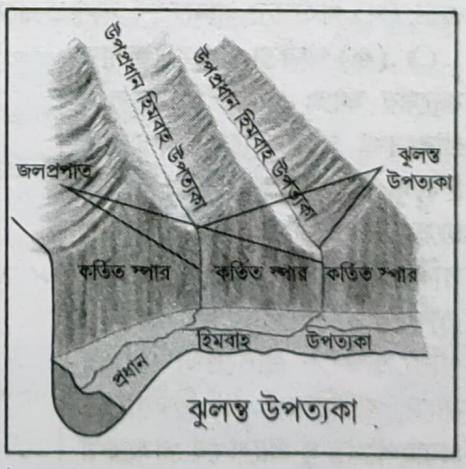

ঝুলন্ত উপত্যকা

) কর্তিত শৈলশিরা ঃ উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হবার সময় উভয়দিকের স্পার বা র্বতের অভিক্ষিপ্তাংশকে ক্ষয় করে। এই স্পারগুলিকে **পলকাটা** বা ***কর্তিত বা কর্তিত স্পার*** বলে।

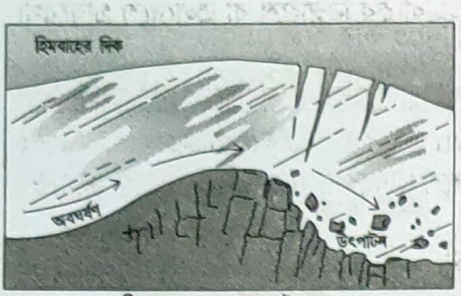

হিমবাহের প্রবাহের ফলে সৃষ্ট রসেমতানে

(৯) রসেমতানে ঃ হিমবাহের গতিপথে কোনো কঠিন শিলা ঢিবির আকারে অবস্থান করলে তা জনিত ক্ষয়ের ফলে সম্মুখভাগ মসৃণ হয় এবং বিপ অংশ উৎপাটনের ফলে অমসৃণ, অসমতল ও যু যুক্ত হয়। এরূপ ভূমিরূপকে ***রসেমতানে বলে।*** কা উপত্যকায় ঝিলাম নদীর উপনদী লিডারের উপত্য রসেমতানে দেখা যায়।

(১০) ক্র্যাগ ও টেল ঃ উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহ প্রবাহ পথে বৃহৎ ও উঁচু কঠিন শিলা অবস্থান করলে তা হিমবাহের ক্ষয়কার্য থেকে পিছনের নরম শিলাকে রক্ষা করে। ফলে বৃহৎ ও কঠিন শিলাখণ্ডটি উঁচু ঢিবির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। একেই ***ক্র্যাগ এবং পিছনের শিলাস্তরকে টেল*** বলে।

ক্র্যাগ ও টেল

(১১) কুঁজ বা হোয়েলব্যাক ঃ পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষয়কার্যের ফলে উঁচু ঢিবির দুই পার্শ্বস্থ অংশ মসৃণ ও খাড়া ঢাল বিশিষ্ট হলে তাকে **কুঁজ** বা স্কটল্যান্ডে এরূপ কুঁজ দেখা যায়।

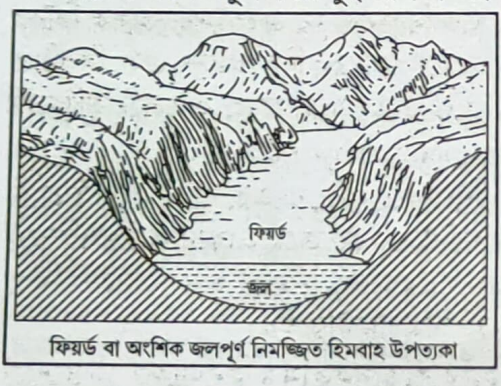

ফিয়র্ড বা অংশিক জলপূর্ণ নিমজ্জিত হিমবাহ উপত্যকা

(১২) আবর্তরেখা ঃ পার্বত্য অংশে কোনো শিলাস্তরের ওপর দিয়ে হিমবাহ প্রবাহিত হবার ক্ষয়কার্যের ফলে শিলাস্তরে সুদীর্ঘ ও সুগভীর গ সৃষ্টি হয়। এই গর্তকে ***আবর্তরেখা*** বলে। কানা ম্যাকেঞ্জি উপত্যকায় আবর্তরেখা দেখা যায়।

(১৩) ফিয়োর্ড ঃ উপকূলবর্তী অঞ্চলে হিমবা ক্ষয়কার্যের ফলে উপত্যকা সমুদ্র-পৃষ্ঠ অপে গভীর হয়। এই অংশ জলমগ্ন হলে একে ফি বলে। নরওয়ে, সুইডেন, গ্রিনল্যান্ড উপকূলে ফিয়োর্ড দেখা যায়। ফিয়োর্ড অংশ কম গভী কম দীর্ঘ হলে তাকে ***ফিয়ার্ড বলে।***

❐ *হিমবাহ সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ ঃ*

পার্বত্য অংশে হিমবাহের ক্ষয়ে যে সকল পদার্থ সৃষ্টি হয় তা - (ক) উচ্চ পার্বত্য অ এবং (খ) পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি করে।

○ (ক) পার্বত্য অঞ্চলে সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ - গ্রাবরেখা ঃ হিমবাহের ক্ষয়জাত দ্রব্যগুলি হিমবাহের সাথে বাহিত হয়ে উপত্যকার বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত হয়। এরূপ সঞ্চয়কে ***গ্রাবরেখা*** বলে। অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাবরেখা বিভিন্ন নামে পরিচিত - (i) হিমবাহের প্রবাহপথের দু-পাশে যে গ্রাবরেখা অবস্থান করে তাকে ***পার্শ্ব গ্রাবরেখা,*** (ii) দুটি হিমবাহের পাশাপাশি মিলনের ফলে মিলনাঞ্চলে ***মধ্য গ্রাবরেখা,*** (iii) হিমবাহ যেখানে এসে শেষ হয় অর্থাৎ গলে

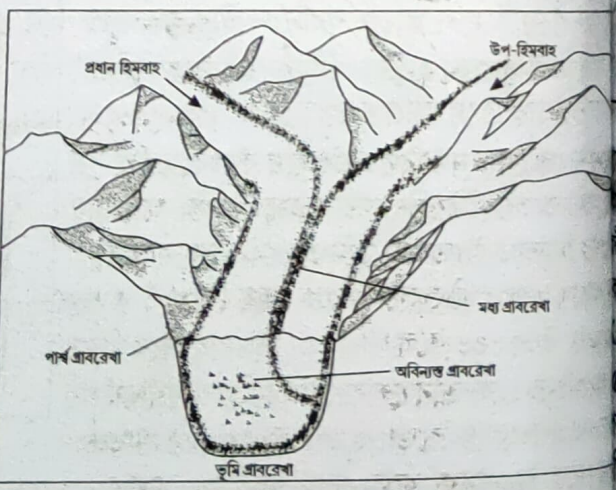

হিমবাহ উপত্যকায় গ্রাবরেখার অবস্থান

সেখানে অবস্থিত গ্রাবরেখাকে ***প্রান্ত গ্রাবরেখা***, (iv) হিমবাহের নিম্নাংশে বা তলদেশে গ্রাবরেখা অবস্থান করলে তাকে ***ভূমি গ্রাবরেখা*** বলে।

এছাড়া (v) হিমবাহের অগ্রভাগে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গ্রাবরেখাকে ***অবিন্যস্ত গ্রাবরেখা***, (vi) বলয়াকারে সঞ্চিত গ্রাবরেখাকে ***বলয়ধর্মী গ্রাবরেখা***, (vii) গ্রাবরেখা একে অপরের ওপর সঞ্চিত হলে তাকে ***রোজেন গ্রাবরেখা*** এবং (viii) সমুদ্র তলদেশে গ্রাবরেখা সঞ্চিত হলে তাকে ***স্তরায়িত গ্রাবরেখা*** বলে।

○ **(খ) পর্বতের পাদদেশে বা নিম্নাংশে গঠিত ভূমিরূপ ঃ** উচ্চ অংশ থেকে হিমবাহ বাহিত পদার্থ পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ সৃষ্টি করে। পাদদেশে হিমবাহের সাথে সাথে জলধারাও ক্ষয়কার্যে সমান ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই এই ক্ষয়কে একত্রে 'Fluvio-Glacial Deposits' বলে।

ড্রামলিন

(১) ড্রামলিন ঃ বিভিন্ন আকৃতির শিলাখণ্ড, নুড়ি, কাঁকর, বালি, কাদা ইত্যাদি হিমবাহ দ্বারা বাহিত হয়ে কোনো স্থানে সঞ্চিত হলে সেখানে উল্টানো নৌকা বা উল্টানো ঝুড়ির মতো ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় একেই ***ড্রামলিন*** বলে।

বৈশিষ্ট্য ঃ (i) ড্রামলিনের উচ্চতা ৬ মি থেকে ৬০ মি পর্যন্ত হয় এবং দৈর্ঘ্য কয়েক মিটার থেকে ২ - ৩ কিমি পর্যন্ত হয়। (ii) ড্রামলিন অংশে হিমবাহ প্রবাহের দিক অমসৃণ এবং বিপরীত দিক মসৃণ হয়। (iii) একসঙ্গে অসংখ্য ড্রামলিন গড়ে ওঠে। ফলে সমগ্র অঞ্চলটি ঝুড়িভর্তি ডিমের মতো দেখায়। তাই একে 'Basket of egg topography' বলে।

(২) এসকার ঃ হিমবাহ বাহিত বিভিন্ন আকৃতির শিলাখণ্ড, নুড়ি, কাঁকর, বালি, কাদা ইত্যাদি জলস্রোতের দ্বারা পরিবাহিত হয়ে পর্বতের পাদদেশে নিম্নভূমিতে জমে আঁকাবাঁকা শৈলশিরার মতো ভূমিরূপ সৃষ্টি করে। একে ***এসকার*** বলে। এসকারের গড় উচ্চতা ৩ - ৫ মিটার কিন্তু দৈর্ঘ্য কয়েক কিলোমিটার হয়।

(৩) বহিঃবিধৌত সমভূমি ঃ হিমবাহের প্রান্তদেশে বরফ যেখানে গলে যায় সেখানে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তরখণ্ড, নুড়ি, পলি, বালি সঞ্চিত হয়। পর্বতের পাদদেশে হিমবাহ ও জলধারার মিলিত কার্যে গঠিত সমভূমিকে ***বহিঃবিধৌত সমভূমি*** বলে। বহিঃবিধৌত সমভূমিতে চাপাপড়া বরফ গলে গেলে গর্তের সৃষ্টি হয়—একে ***কেটল*** বলে এবং এই গর্তে জল জমলে ***কেটল হ্রদ*** সৃষ্টি হয়। কেটল হ্রদের তলদেশে স্তরে স্তরে সঞ্চিত পলিকে **ভার্ব** বলে।

(৪) কেম ও কেম সোপান ঃ হিমবাহ অধ্যুষিত পর্বতের পাদদেশে কোনো হ্রদ থাকলে ওই হ্রদে কাঁকর, বালি, কাদা সঞ্চিত হয়ে ত্রিকোণাকার ভূমিরূপ সৃষ্টি করে। দ্বীপের মতো দেখতে এই ভূমিরূপকেই ***কেম*** বলে। কেম ধাপে ধাপে গঠিত হলে তাকে **কেম সোপান** বা Kame - Terrace বলে।

(৫) আগামুক, বোল্ডার ক্লে বা টিল ঃ হিমবাহ কার্যে পর্বতের পাদদেশে বড়ো বড়ো প্রস্তরখণ্ড সঞ্চিত ভূমিরূপকে **আগামুক** বলে এবং বালি ও কাদার উপর প্রস্তরখণ্ড সঞ্চিত ভূমিরূপ হল **বোল্ডার ক্লে** বা **টিল**।

❖ বায়ুর কাজ ❖

❐ **ভূমিকা ঃ** নদী ও হিমবাহের মতোই বায়ু ভূপৃষ্ঠের কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ক্ষয়, বহন অবক্ষেপণের মাধ্যমে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়। তবে এককভাবে বায়ুর কাজের পরি বায়ু ও জলধারার সঙ্গে মিলিত কার্যে ভূমিরূপের সর্বাধিক পরিবর্তন ঘটে।

বায়ু কোথায় কোথায় কাজ করে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়? ঃ বৃষ্টিহীন ও উদ্ভিদ উন্মুক্ত মরুভূমি* ও মরুপ্রায়* অঞ্চলে বায়ুর কার্যের মাত্রা সর্বাধিক। ক্রান্তীয় ও নাতিশীতে উভয়প্রকার মরুভূমিতেই বায়ু ভূমিরূপের পরিবর্তন সাধন করে। তাছাড়া উপকূল অঞ্চলে বায়ু ভূমিরূপ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

○ ***মরুভূমি অঞ্চলে বায়ু প্রধান শক্তিরূপে কাজ করে কেন? (ক) যান্ত্রিক আবহবিকারের প্রাবল্য*** *ঃ মরুভূমি অঞ্চলে দিনরাত্রি এবং শীতগ্রীষ্মের উষ্ণতার তারতম্য খুব বেশি হওয়ায় শিলা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো খণ্ডে ভেঙে যায় এবং অবশেষে বালিকণায় পরিণত হয়—যা বায়ুর ক্ষয়কাজে উপাদান হিসাবে কাজ করে। **(খ) বৃষ্টির অভাব ঃ** মরু অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম হওয়ায় গাছপালা জন্মাতে পারে না ফলে বায়ু বাধাহীন ভাবে বেগে প্রবাহিত হতে পারে।*

○ ***বিভিন্ন প্রকার মরুভূমি ঃ*** *বায়ুর ক্ষয়, বহন ও অবক্ষেপণের কারণে তিন ধরনের মরুভূমির সৃষ্টি হয় - **(১) বালুকাময় মরুভূমি ঃ** বালি দ্বারা গঠিত মরুভূমি সাহারায় **আর্গ** এবং তুর্কিস্থানে **কুম** নামে পরিচিত। **(২) পাথুরে মরুভূমি ঃ** বিভিন্ন আকৃতির প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গঠিত মরুভূমিকে আলজিরিয়ায় **রেগ** এবং লিবিয়া ও মিশরে **সেরীর** বলে। **(৩) শিলাময় মরুভূমি ঃ** কেবলমাত্র শিলা দ্বারা গঠিত মরুভূমিকে সাহারায় **হামাদা** বলে।*

❐ **বায়ুর কাজ ঃ** বায়ু (ক) **ক্ষয়,** (খ) **বহন** ও (গ) **সঞ্চয়** এই তিন প্রকার কার্যের মাধ্যমে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়।

○ **(ক) বায়ুর ক্ষয়কাজ ঃ** মরুভূমি ও মরুপ্রায় অঞ্চলে বায়ু (১) **অবঘর্ষ** (Abrasion), (২) **অপবাহন**** (Deflation) এবং (৩) **ঘর্ষণ** (Attrition)-এই তিন পদ্ধতিতে ক্ষয়কাজ করে থাকে।

বায়ুর ক্ষয়কাজ নির্ভর করে - (i) বায়ুর গতিবেগ, (ii) বালুকণার পরিমাণ ও প্রকৃতি, (iii) শিলাস্তরের গঠন, (iv) উদ্ভিদের বিস্তার ও প্রকৃতি প্রভৃতির ওপর।

(১) অবঘর্ষ ঃ মরু অঞ্চলে বায়ুর সাথে বাহিত বালি, ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড শিলাস্তরের ওপর আছড়ে পড়ে এবং শিলার ওপর আঁচড় কাটা দাগ, গভীর ক্ষত, মৌচাকের মতো দাগ, অসংখ্য ছিদ্র প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। একে ***অবঘর্ষ*** বলে। বালির মধ্যে কঠিন কোয়ার্জ কণা থাকলে অবঘর্ষ প্রক্রিয়া দ্রুত কার্যকর হয়। **(২) অপবাহন ঃ** প্রবল বায়ু প্রবাহে বালি ও পলিকণা মরুভূমির একস্থান থেকে অন্যস্থানে অপসারিত হয়। একেই **অপবাহন** বলে। অপসারণে ছোটো-বড় গর্ত, অবনত স্থান প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। অবনমনের ফলে সৃষ্ট নিম্নভূমিকে থর মরুভূমিতে বলে। **(৩) ঘর্ষণ ঃ** ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে বাহিত বিভিন্ন আকৃতির প্রস্তরখণ্ড ও নুড়ি পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে বালিকণায় পরিণত হয়। একে ***ঘর্ষণ*** ক্ষয় বলে।

○ **(খ) বহন ঃ** মরুভূমি অঞ্চলে বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় বলে বিভিন্ন পদার্থ বায়ুর সঙ্গে বাহিত হয়ে স্থানান্তরিত হয়। বায়ুর বহনক্ষমতা নির্ভর করে (i) বায়ুর গতিবেগ (ii) পদার্থের আয়তন ও (iii) উদ্ভিদের বিস্তারের ওপর। বায়ু তিনটি পদ্ধতিতে বহন কাজ করে। **(১) ভাসমান ঃ** সূক্ষ্ম পদার্থসমূহ বায়ুপ্রবাহের ফলে একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয়। **(২) লম্ফদান ঃ** অপেক্ষাকৃত মাঝারি আকারের নুড়ি, শিলাখণ্ড ভূমিতে ধাক্কা খেয়ে লাফি লাফিয়ে এগিয়ে চলে। (৩) **গড়ানে প্রক্রিয়া ঃ** বড়ো আকারের নুড়ি ও প্রস্তরখণ্ড বায়ুপ্রবাহের ফলে ভূমির সাথে গড়িয়ে গড়িয়ে অগ্রসর হয়।

---

* যেখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টি ২৫ সেমির কম তাকে মরুভূমি এবং যেখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টি ২৫-৫০ সেমি তা মরুপ্রায় অঞ্চল বলে। ** সূত্র : ভূগোল পরিভাষা - পঃ বঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

○ **(গ) সঞ্চয় ঃ** বায়ুর গতিবেগ কমে গেলে বা উচ্চভূমি দ্বারা বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হলে বায়ুবাহিত পদার্থগুলি সঞ্চিত হয়। বায়ু তিনভাবে সঞ্চয় কাজ করে থাকে।

❐ ***বায়ুর ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ ঃ***

(১) ইয়ার্দাং (Yardang) ঃ পর্যায়ক্রমে উল্লম্বভাবে সজ্জিত কঠিন ও কোমল শিলা দ্বারা গঠিত কোনো উচ্চভূমি অঞ্চলে বায়ু শিলাস্তরের সাথে সমান্তরালে প্রবাহিত হলে অবঘর্ষ পদ্ধতিতে ক্ষয়কার্যের ফলে কঠিন শিলা কম ক্ষয় হয়ে স্বল্প উচ্চতাযুক্ত রৈখিক খাড়া দেয়ালযুক্ত ভূমিরূপ গঠন করে এবং দুটি কঠিন শিলাস্তূপের মধ্যবর্তী কোমল শিলা বেশি ক্ষয় হয়ে সুড়ঙ্গের ন্যায় আকার ধারণ করে। কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত মোরগের ঝুঁটির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ভূমিরূপকে **ইয়ার্দাং** বলে। ইয়ার্দাং-এর উচ্চতা গড়ে ৭ মিটার এবং বিস্তার ৭০ - ৪০০ মিটার পর্যন্ত হয়। ইয়ার্দাং ক্ষয় হয়ে তীক্ষ্ণ আকার ধারণ করলে তাকে *নিডিল* বলে।

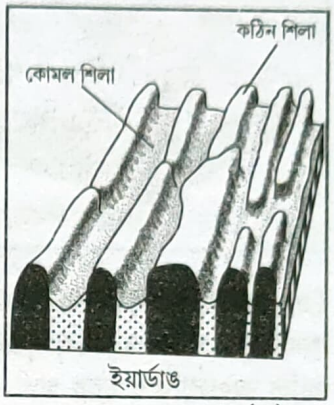

(২) জুগ্যান (Zeugen) ঃ মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলে কঠিন ও কোমল শিলা পর্যায়ক্রমে অনুভূমিকভাবে অবস্থান করলে শিলাস্তরের ফাটল, চ্যুতিরেখা, জোড় (Joint), স্তরায়ণ তল প্রভৃতি শিলার দুর্বল স্থানগুলি বায়ুর অবঘর্ষ পদ্ধতিতে ক্ষয় হয়। কোমল শিলা অপেক্ষা কঠিন শিলা কম ক্ষয় হয়ে প্রায় সমতল চূড়া বিশিষ্ট ভূমিরূপ সৃষ্টি করলে তাকে **জুগ্যান** বলে। জুগ্যান গুলির উচ্চতা ২-৪০ মিটার পর্যন্ত হয়। **কালাহারি ও অস্ট্রেলিয়** মরুভূমিতে জুগ্যান দেখা যায়।

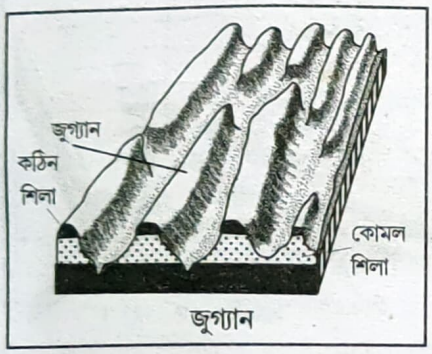

(৩) গৌর বা গারা (Gours or Garas) ঃ কঠিন ও কোমল শিলাদ্বারা পর্যায়ক্রমে অনুভূমিকভাবে গঠিত বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্নমুখী বায়ুর দ্বারা অবঘর্ষ প্রণালীতে নীচের কোমল শিলাস্তর বেশি ও উপরের কঠিন শিলাস্তর কম ক্ষয় হয়। ফলে প্রস্তরখণ্ডটি ব্যাং-এর ছাতার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়। একেই *গৌর বা গারা* বলে। সাহারা ও ইরান মরুভূমি অঞ্চলে অধিক সংখ্যায় গৌর দেখা যায়।

গৌর

(৪) ভেন্টিফ্যাক্ট (Ventifact) ঃ বায়ুর প্রবাহপথে কোনো বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড অবস্থান করলে এর প্রতিবাত পার্শ্ব দীর্ঘকাল ধরে অবঘর্ষ পদ্ধতিতে ক্ষয় হয়ে মসৃণ ও সূচালো হয়। শিলাস্তরটি ব্রাজিল দেশীয় বাদামের ন্যায় আকৃতি ধারণ করে। একেই *ভেন্টিফ্যাক্ট* বলে। প্রায় সকল মরুভূমিতেই ভেন্টিফ্যাক্ট দেখা যায়।

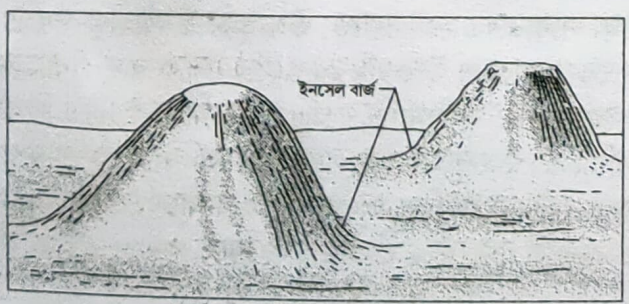

ইনসেল বার্জ

(৫) ড্রেইকান্টার (Drei-kanter) ঃ মরুভূমির কোনো প্রস্তরখণ্ড যদি বিভিন্ন ঋতুতে প্রবাহিত ভিন্নমুখী বায়ুপ্রবাহে অবঘর্ষ পদ্ধতিতে দীর্ঘকাল ক্ষয় হয়ে ত্রিকোণাকার বা ক্ষুদ্র পিরামিড আকৃতি ধারণ করে, তাকে *ড্রেইকান্টার* বলে। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি অঞ্চলে ড্রেইকান্টার দেখা যায়।

(৬) পেডিমেন্ট ও ইনসেলবার্জ (Pediment & Inselberg) ঃ মরুভূমি অঞ্চলে কোনো উচ্চভূমি

দীর্ঘকাল ধরে বায়ু ও জলধারার মিলিত ক্ষয়কার্যের ফলে উচ্চভূমির সম্মুখভাগে প্রায় সমতল বা মৃদু ঢালু ভূমিভাগের সৃষ্টি হলে তাকে ***পেডিমেন্ট*** বলে। পেডিমেন্ট শিলাখণ্ড ও বালি দ্বারা আবৃত থাকতে পারে, আবার কখনো তা উন্মুক্ত অবস্থাতেও থাকতে পারে। পেডিমেন্টের ওপর স্থানে স্থানে কঠিন শিলাদ্বারা গঠিত উচ্চভূমি অবশিষ্টাংশরূপে অবস্থান করে। খাড়াভাবে দণ্ডায়মান এইরূপ অনুচ্চ টিলা বা পাহাড়গুলিকে ***ইনসেলবার্জ*** বলে।

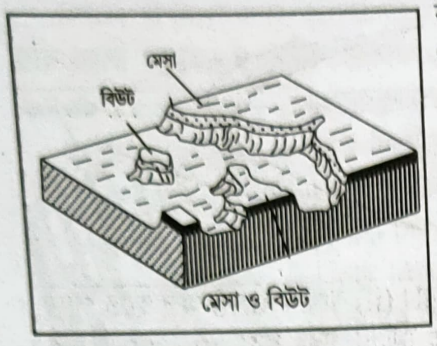

(৭) মেসা ও বিউট (Mesa & Butte) : বায়ু ও জলধারার মিলিত কার্যে মরুভূমি অঞ্চলের উচ্চ মালভূমি ক্ষয় হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে টেবিলের আকারে অবস্থান করলে তাকে ***মেসা*** বলে। মেসা ক্ষুদ্রাকৃতির হলে তা **বিউট** নামে পরিচিত।

(৮) অপবাহন সৃষ্ট গর্ত বা বেসিন (Deflation Hollow or Deflation Basin) : মরুভূমি অঞ্চলের পলি ও বালি বৃষ্টির অভাবে শিথিল অবস্থায় থাকে বলে প্রবল বায়ুপ্রবাহে পলি ও বালি অপসারিত হয়ে গর্ত বা অবনমিত স্থানের সৃষ্টি হয়, ***একেই অপবাহন সৃষ্ট গর্ত বা 'Blow out' বলে।*** মিশরের পশ্চিমে অবস্থিত **কাতারা (Qattara) পৃথিবীর বৃহত্তম অপসারণ সৃষ্ট গর্ত।**

ভারতের থর মরুভূমি অঞ্চলে অপবাহনের ফলে ছোটো ছোটো গর্তের সৃষ্টি হয়। এই গর্তগুলিতে জল জমে সাময়িক হ্রদের সৃষ্টি হয়। এগুলি ***'ধান্দ'*** নামে পরিচিত।

❐ ***বায়ুর সঞ্চয় কার্যের ফলে গঠিত ভূমিরূপ :***

কোনো উচ্চভূমি বা ঝোপঝাড় দ্বারা বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হলে অথবা অন্য কোনো কারণে বায়ুর গতিবেগ কমলে বায়ুদ্বারা বাহিত পদার্থসমূহের সঞ্চয় ঘটতে থাকে। বায়ুর সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্ট প্রধান ভূমিরূপগুলি হল (ক) **বালিয়াড়ি** ও অনুরূপ সঞ্চয়জাত ভূমি এবং (খ) **লোয়েস**।

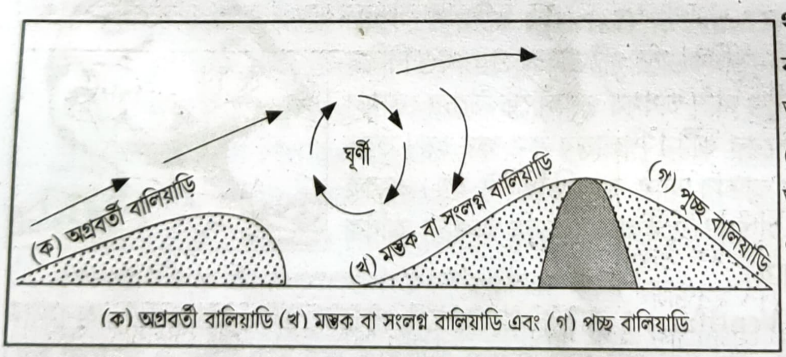

(ক) অগ্রবর্তী বালিয়াড়ি (খ) মস্তক বা সংলগ্ন বালিয়াড়ি এবং (গ) পুচ্ছ বালিয়াড়ি

○ (ক) বালিয়াড়ি : বায়ু প্রবাহের দ্বারা বালুকারাশি একস্থান থেকে অন্যস্থানে বাহিত হয়ে সঞ্চিত হওয়ার পর দীর্ঘ ও উচ্চ বালি স্তূপ গঠন করে। একেই ***বালিয়াড়ি বলে।*** সাধারণত ঝোপঝাড়, উচ্চভূমি ও পাহাড়-পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বালিরাশির সঞ্চয় ঘটে। ঝোপঝাড় ও উচ্চভূমির যে দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় সেই দিকেই বালিয়াড়ি সৃষ্টি হলে তাকে **মস্তক বালিয়াড়ি** বলে। উচ্চভূমির বিপরীত দিকে গঠিত বালিয়াড়ি **পুচ্ছ বালিয়াড়ি** নামে পরিচিত। উচ্চভূমির দুই পাশে সৃষ্ট বালিয়াড়িকে **পার্শ্ব বালিয়াড়ি** এবং ঘূর্ণিবাতাসের প্রভাবে মস্তক বালিয়াড়ির কিছু আগে গঠিত বালিয়াড়িকে **অগ্রবর্তী বালিয়াড়ি** বলে। মরুভূমি ছাড়াও মরুপ্রায় অঞ্চলে এবং হ্রদ ও সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে বালিয়াড়ি দেখা যায়।

তবে বালিয়াড়ি এক জায়গায় স্থির থাকে না। বায়ুপ্রবাহের সাথে সাথে বালিয়াড়িগুলি প্রতিবাত ঢাল থেকে অনুবাত ঢালের দিকে এগোতে থাকে। তাই বালিয়াড়ির প্রতিবাত ঢাল মৃদু ঢালু কিন্তু অনুবাত ঢাল বেশ খাড়া। বালিয়াড়িগুলি বছরে ৫-৩০ মিটার পর্যন্ত স্থান পরিবর্তন করে।

বালিয়াড়ির শ্রেণিবিভাগ ঃ বিজ্ঞানী ব্যাগনল্ড (Bagnold) বালিয়াড়িগুলিকে প্রধান দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। (১) *তির্যক বালিয়াড়ি বা বার্খান* এবং (২) *অনুদৈর্ঘ্য বা সিফ্ বালিয়াড়ি*।

(১) তির্যক বালিয়াড়ি বা বার্খান ঃ বায়ুর প্রবাহ পথের আড়াআড়ি অবস্থিত অর্ধচন্দ্রাকার বালিয়াড়িগুলিকে *বার্খান* বলে। যে সকল স্থানে বায়ু একদিক থেকে প্রবাহিত হয় সেখানেই বার্খান গঠিত হয়। বার্খানের সম্মুখভাগ উত্তল এবং পিছনের অংশ অবতল হয়। বার্খানের দুই কিনারায় অর্ধচন্দ্রাকারে দুটি শিং-এর মতো শিরা অবস্থান করে। সকল মরুভূমিতেই বার্খান লক্ষ করা যায়।

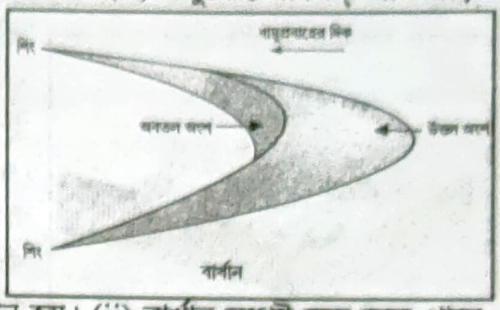

বৈশিষ্ট্য ঃ (i) বার্খানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সাধারণত সমান হয়। (ii) বার্খান যথেষ্ট ক্ষুদ্র হতে পারে, যেমন উচ্চতায় মাত্র ২ - ৩ মিটার এবং প্রস্থ ২০ - ৩০ মিটার। আবার মিশরের মরুভূমিতে বার্খানগুলি উচ্চতায় ৩০ মিটার ও দৈর্ঘ্যে ২০০ মিটার পর্যন্ত হয়। (iii) এর প্রতিবাত অংশ কম ঢালু কিন্তু অনুবাত ঢাল খাড়া হয়।

(২) অনুদৈর্ঘ্য বা সিফ্ বালিয়াড়ি ঃ বায়ুপ্রবাহের সমান্তরালে দীর্ঘ ও সংকীর্ণ শৈলশিরার মতো বালির পাহাড়গুলিকে **সিফ্ *বালিয়াড়ি*** বলে। এই বালিয়াড়ি দেখতে কতকটা তলোয়ারের মতো বলে একে **'সিফ্ *বালিয়াড়ি*** বলে। ***ব্যাগনল্ডের*** মতে বার্খান থেকেই এই বালিয়াড়ির সৃষ্টি হয়। নিয়মিত বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তনের ফলে বার্খানের একটি শিং অংশে ক্রমাগত বালির সঞ্চয় ঘটতে থাকে এবং শিং প্রসারিত হয়ে সিফ্ বালিয়াড়ির আকার ধারণ করে।

বৈশিষ্ট্য ঃ (i) সিফ্ বালিয়াড়ির দৈর্ঘ্য কয়েক কিমি থেকে কয়েকশো কিমি হয় এবং গড় উচ্চতা কয়েকশো মিটার পর্যন্ত হতে পারে। মিশরের মরুভূমিতে এদের উচ্চতা ১০০ মিটার এবং ইরানে ২১০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। **(ii)** বালিয়াড়িগুলির প্রস্থ উচ্চতার প্রায় ৬ গুণ হয়। **(iii)** সিফ্ বালিয়াড়ি একে অপরের সমান্তরালে গড়ে ওঠে। দুটি বালিয়াড়ির মধ্যবর্তী অংশ বালিবিহীন হামাদা বা রেগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে। এই করিডরগুলি সাহারায় **'গাসি'** (Gassi) নামে পরিচিত। এই করিডরগুলি [যা ক্যারাভান (Caravan) নামে পরিচিত] যাতায়াতের মাধ্যম ব্যবহৃত হয়। **(iv)** বালিয়াড়ির শীর্ষদেশ তীক্ষ্ণ করাত আকৃতির হয়। **(v)** মরুভূমির অভ্যন্তরে যেখানে বায়ুর বেগ বেশি সেখানেই সিফ্ বালিয়াড়ি গড়ে ওঠে। সিফ্ বালিয়াড়ি সাহারা, কালাহারি, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের থর মরুভূমিতে দেখা যায়।

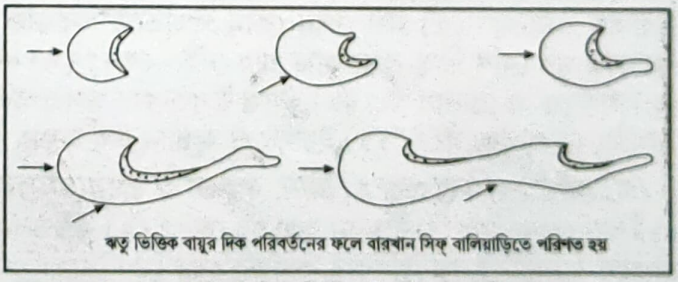
ঋতু ভিত্তিক বায়ুর দিক পরিবর্তনের ফলে বারখান সিফ্ বালিয়াড়িতে পরিণত হয়

○ (খ) লোয়েস ঃ মরুভূমি ও মরুপ্রায় অঞ্চলে হলুদ ও ধূসর বর্ণের কোয়ার্জ, ফেলসপার, ডলোমাইট ও অন্যান্য খনিজ সমৃদ্ধ শিথিল সূক্ষ্ম পলিকণার সঞ্চয়কে *লোয়েস* বলে। বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে এই সূক্ষ্ম পলিকণা বহুদূরে পরিবাহিত ও সঞ্চিত হয়ে যে ভূমি গঠন করে তাকেই **লোয়েস ভূমি** বলে।

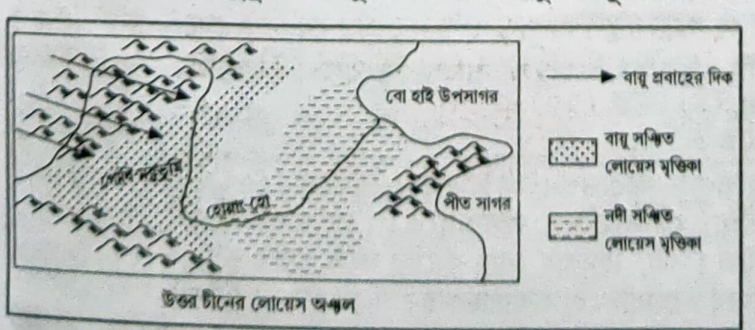

মধ্য এশিয়ার গোবি মরুভূমি থেকে হাজার হাজার বছর ধরে বায়ু লোয়েস মৃত্তিকা বহন করে চিনের হোয়াংহো অববাহিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সমভূমি গঠন করেছে।

○ ***মরুভূমি অঞ্চলে বায়ু ও জলধারার মিলিত কাজ ও ভূমিরূপ :*** *মরুভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুব কম কিন্তু যখন বৃষ্টিপাত হয়, তখন তার তীব্রতা অধিক।* ফলে মরুভূমি ও মরুপ্রায় অঞ্চলে আবহবিকার, বায়ু ও জলধারা মিলিতভাবে কাজ করে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায়। *(i) মরুভূমি অঞ্চলে বায়ু ও জলধারার মিলিত কাজের ফলে সৃষ্ট অবশিষ্ট টিলা বা পাহাড়কে* ***ইনসেলবার্জ*** *এবং (ii) উচ্চভূমি থেকে মৃদুঢালু ভূমিকে* ***পেডিমেন্ট*** *বলে। (iii) উচ্চভূমির পাদদেশে নুড়ি, পলি, বালি সঞ্চিত হয়ে তৈরি হয়* ***পলল ব্যজনী****। (iv) মরুভূমির পাহাড়ঘেরা অবনমিত অঞ্চলগুলিতে জল জমে তৈরি হয়* ***বোলসন ও প্লায়া*** *এবং (v) প্লায়া অংশে পলি জমে সৃষ্টি হয়* ***বাজাদা বা বাহাদা****। (vi) মরুভূমির অব্যবহৃত শুষ্ক নদীখাতকে বলে* ***ওয়াদি।***

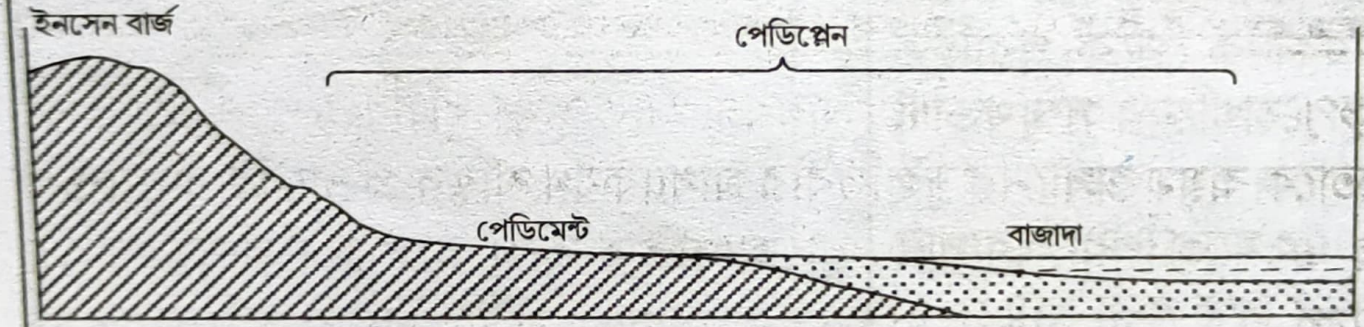

মরুভূমি অঞ্চলে জল ও বায়ুর ক্ষয় ও সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ